আমরা চারজন

জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

গৌতম মিত্র

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশের প্রায় সমস্ত উপন্যাসের নায়ক বা অন্যান্য চরিত্র হয় একসময় লিখত বা এখন কবিতা বা গল্প-উপন্যাস লেখে। ‘‘আমরা চারজন’’ উপন্যাস এর ব্যতিক্রম তো নয়ই বরং এই উপন্যাসটির প্রধান তিনটি চরিত্র, অনাথ, সুধামাধব ও প্রথম পুরুষে কথক শ্যামল, হয় গল্প-উপন্যাস বা কবিতা লেখে। এবং তারা তিনজন ঊষা নামের যে মহিলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়, সে-ও সাহিত্য-মনস্ক। এই উপন্যাসে কিছুই ঘটে না। কোনও প্লট নেই। বিভিন্ন কম্বিনেশনে এই চরিত্রগুলো উপন্যাস জুড়ে শুধু মিলিত হয় এবং অনর্গল কথা বলে যায়।

কী কথা বলে? সাহিত্য নিয়ে, যাপন সম্পর্কে, জীবনবোধ নিয়ে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে:

‘—নায়ক লেড়িকুত্তা হতে পারে; কুষ্ঠরুগি হতে পারে; কিম্বা অধিনায়ক, গণনায়ক, ল্যান্স-নায়ক অথবা পট্টনায়ক; যা খুশি হোক, তাতে লেখকের কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোনও একটা গল্পের সত্যিকারের রচয়িত্রী ভাবনা যখন মনের ভিতর এল, সেই থেকে মীমাংসাহীনতার বেদনার শুরু —। আপনাকে অতিষ্ঠ ক’রে তুলবে কিন্তু; সাধারণ মানুষের মতো ফুর্তি করতে পারবেন না আর; স্বাভাবিক জীবন আপনার কাছে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সাংসারিক মানুষদের সচ্ছল সহজ জীবনকে ঈর্ষা করবেন আপনি। মনের ভিতর যে-ভাব জেগেছে আপনার, তা আপনাকে উদ্ঘাতিনী নদীর দিকে নিয়ে যেতে চাইবে। সমস্ত পরিত্যাগ ক’রে আসতে বলবে—তার পর আপনার কাছ থেকে ভাষা চাইবে, শব্দ চাইবে, অবিকল প্রকাশ চাইবে; নানা রকম ভাবে আপনি তাকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু তবুও তার কোনও তৃপ্তি হবে না; তাকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে অনেক বড়ো-বড়ো কলম হার মেনে যায়; অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, স্বাভাবিক সাংসারিক

মানুষ এই উৎপীড়নের থেকে দূরে স'রে কেমন নির্বিঘ্নে জীবনের কত খুঁটিনাটি সুখ উপভোগ করছে। কিন্তু কোনও শিল্পীর জন্য সে-সুখ নেই। দরিদ্রতাই লেখকের রক্তের সব-চেয়ে মারাত্মক জীবাণু নয়। তার জীবনের উৎপীড়ন হচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ যা লেখা হয়, তার চেয়ে একেবারেই অন্য রকম লেখার ভার সে নিয়েছে। সেই থেকে ওরা তাকে আর নিস্তার দেয় না—মৃত্যু পর্যন্ত এই মহাশ্বেতা স্তন্য-পাখিনীকে কোলে পুষে-পুষে বহন করতে হয়; মহাশ্বেতা অথচ করালী সে—কোনও শান্তি নেই ফাঁকি নেই—পালাবার পথ নেই—'

(আমরা চারজন, ১৯৩৩)

একসময় উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধ লেখার কথা ভেবেছিলেন জীবনানন্দ। অনেক প্রবন্ধ। আসলে জীবনানন্দের উপন্যাস অনেকগুলো আইডিয়ার সহাবস্থান। ১৯৮০-তে প্রথম প্রকাশিত হয় দেল্যুজ-এর ''অ্যা থাউজ্যান্ড প্লাটু''। তাতে একটি অধ্যায় ''রাইজোম''। আমরা জানি রাইজোম বা মৌল কাণ্ড হল বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে অযৌন ভাবে বংশবিস্তার। দেল্যুজ এই ভাবনাটি খুব সংক্ষেপে বলতে হলে এইভাবে ভেবেছেন যে একটা ভাবনা থেকে গুণিতকে বহুভাবনার সৃষ্টি হওয়া। ভার্টিকাল কোনও ভাবনা নয়, রাইজোম যেমন শিকড় ও কাণ্ডের ফর্মুলায় শুধু আটকা পড়ে থাকে না, ভাবনার বহুমুখীনতায় হরাইজন্টালি ক্রমাগত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

''রাইজোম'' অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো হল :

১. any point of a rhizome can be connected to any other, and must be

২. multiplicilines

৩. rhizome may be broken– but it will start up again on one of its old lines

৪. a rhizome is not amenable to any structural or generative model, it is a map and not a tracing.

এখন প্রশ্ন জীবনানন্দর লেখায় এই লক্ষণগুলো কি ধরা পড়ে এবং ধরা পড়লে কীভাবে ধরা পড়ে। জীবনানন্দ দাশের গল্প উপন্যাস বা কবিতা পড়তে পড়তে আমার তো খুব মনে হয় প্রতিটি বিন্দুই উড়ান সক্ষম। প্রতিটি বিন্দু একধরনের আইডিয়ার জন্ম দেয়। যেমন:

''অনাথ: এরা চেনে শুধু মপাসাঁ, ফ্লবেয়ার— দোদে। তবু যদি বুঝতাম, ভলতেয়ার বা মোলিয়ে-র মতো ঠাট্টা করার শক্তি আছে। কিন্তু, না! ভাঁড়ামোর জন্য এরা

বার্নার্ড শ'র নজির সামনে রেখেছে—ভলতেয়ার-এর কাছে শ' কী? —একটা কড়ে আঙুলের নখও তো না। আনাতোল ফ্রাঁসকে বুঝবার কোনও সামর্থ নেই এদের—তাঁর "পেঙ্গুইন আইল্যান্ড" নভেলটা প'ড়ে দেখো; ও-রকম জিনিস এ বাংলা সাহিত্যে কোনও দিনও হবে! ফরাসি লিটারেচারের ধাষ্টামো চিপ্টেন-কাটা ফোঁপরদালালি নোংরামি ছাড়া আর কোনও কিছুর জন্য উপযুক্ত নয় আমাদের লেখকরা।

একটু চুপ থেকে বলল অথচ ফরাসি সাহিত্যের যা বড়ো জিনিস দুর্দান্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—তার ধার দিয়েও আমরা কেউ এগোতে পারি না—

উষা: রলাঁ অবিশ্যি বিদ্রূপের জন্য বিখ্যাত নন।

অনাথ চোখ কপালে তুলে: রলাঁ? জাতে শুধু ফরাসি; চিরদিন রইলেন ফ্রান্সের বাইরে। ওঁর ভিতর ফরাসি সংস্কারের ধারা শুকিয়ে ম'রে গেছে। খাঁটি রাশিয়ানের মতো লেখেন।'

একেকসময় ভাবুক জীবনানন্দ যেন ঔপন্যাসিক জীবনানন্দকে ছাপিয়ে যান :

'—একটা বিপ্লবের কথা আমিও ভাবছি—বিপ্লব না হ'লে চলবে না

—কীসের বিপ্লব?

—দেশের, সমাজের, মানুষের ভিতরের জীবনের একটা মেয়ের, যে একটা শক্ত বাঁধনে বাঁধা, তার। সব রকম বিপ্লব। কোনওটা ছেড়ে কোনওটা হবে না

— অত বড়ো বিপ্লব কে করবে?

—করতে হবে।

—হবে না কিছু।

—কেন এ-রকম কথা বলছেন! ফ্রান্স-এ বিপ্লব হ'ল তার পর এল নেপোলিয়ন। রাশিয়া'য় হ'ল- স্টেট এল। এই সব ভেবে কি আপনি চিন্তিত হয়ে পড়ছেন?

—আপনি পারবেন বিপ্লব চালাতে?

—আমি সব ভেবে দেখেছি। ভাবতে গেলে বারবার ভাবতে গেলে—খুবই তলিয়ে ভাবতে গেলে—আমি দেখেছি, একটা মস্ত বড়ো নাস্তিবাদের দর্শন সব-কিছুকে চেপে ব'সে থাকে। সে-দর্শনকে কেটে ফেলার শক্তি যিশুর নেই, শেক্সপীয়র-এর নেই, মার্কস-এর নেই, লেনিন, গান্ধিজির নেই। হতাশাই হয়তো শেষ কথা মানুষের জীবনের। মৃত্যুই খুব সম্ভব ভারি শোকাবহ ভাবে ঘটবে মানুষের সমাজের। কিন্তু, তবুও, কেবলই রোগে দায় সঙ্গে, একটানা গ্লানিতে পচে-পচে, আমাদের যেন মৃত্যু না হয়।

—তা তা তো হবেই। কী ক'রে ঠেকাবেন আপনি?

—নিরাশার কথা বলবেন না। অসিতকে আমি ব'লে দিয়েছি আমার এখানে যেন আর না আসে। সকলকেই ব'লে দিয়েছি।

—কেন?

—আমার ভালো লাগে না ও-সব আর। আমি যা চাই, তা পাচ্ছি না-

—বিপ্লব করবেন কাদের দলে মিশে?

উষা বেণি বাঁধছিল, বাঁধতে-বাঁধতে বল্লে, কারু দলে নয়

—একা? আপনার কাজের সংকল্পনা কী? কী সংগঠন করেছেন? কাউকে খবর দিয়েছেন?

—সবই করব। সবই দাঁড় করাব আমি

—সবই হতাশায় আর মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যাবে। তাকিয়ে দেখুন: দু'হাজার বছর দূরের যিশুর জেরুজালেম-এর দিকে আজ, প্যালেস্টাইন-এর দিকে; দান্তে এই ইতালিকে ইউরোপকে দেখলে তাঁর মৃত্যুর পরে এক হাজার বছর অগ্রসর হয়েছে, না পিছিয়ে গেছে, কোনটা ভাবতেন? সক্রেটিস প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে গিয়েছিলেন গ্রিসকে সবল, স্নিগ্ধ, যুক্তিমর্মী করতে; অসুস্থ ছিল তখনকার গ্রিস—কিন্তু, হাজার বছর পরে এখন কী হয়েছে। ফ্রান্স-রাশিয়া'র কথা তো আপনিই বললেন—আমাদের দেশের কথা বরং না-ই-বা বললাম— উপনিষদের পুরুষেরা, কৃষ্ণের মতন অত বড়ো এক জন পুরাণপুরুষ, বুদ্ধদেব—এই সে-দিনের রামমোহনের মতন এক জন বড়ো মানুষ—আজ রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজি— কিন্তু কী হচ্ছে?'

(আমরা চারজন, ১৯৩৩)

সময়কে ওলট-পালট করে ফেলেন জীবনানন্দ দাশ। মৃত্যু যেন সবথেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অনাথের মৃত্যুই যদি দেখি, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। এত নিস্পৃহতা একজন লেখক অর্জন করেন কীভাবে:

'এক-আধ মিনিটের মধ্যেই অনাথ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, হাঁ ক'রে দাঁত বার ক'রে, গোঁফ চাগিয়ে, কেমন বিশ্রী মড়ার মতো ম'রেও নি, ঘুমোয়ও নি,

কোথায় চ'লে গিয়েছে যেন।

অনাথ ফিরে এল না আর।

ঠিক কখন মরেছে টের পেলাম না। বিছানার পাশে ছিলাম না কেউ।

অনাথ আচ্ছন্ন হয়ে পড়বার পর ডেক-চেয়ার টেনে আমরা দূরে স'রে আমাদের নিজেদের কথা বলাবলি করছিলাম—অনাথের কথা ভাববার দরকার ছিল না, সে তো নেই, কোনও দিন থাকবে না আর। জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম।'

(আমরা চারজন, ১৯৩৩)

মার্শেল প্রুস্ত ‘‘হারানো সময়’’-এর খোঁজে সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। প্রুস্তের ইচ্ছে ছিল মুহূর্তের ঝলকানিকে পাকড়াও করে তাকে আলাদা ও নিশ্চল করা। শুদ্ধ সময়কে তার শুদ্ধ স্থিতিতে পৌঁছে দেওয়া। দস্তয়েভস্কি এক ‘‘আবেষ্টন’’-এর কথা বলেছিলেন, যা তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে জীবনের অজস্র যাপনকে ফিরিয়ে দিত। এই অভিজ্ঞতা বিশেষত তাঁর মৃগীরোগ আক্রমণের সময় বেশি হত। ভার্জিনিয়া উল্ফ সারাজীবন ধরে এক ‘‘মুহূর্ত’’-এর কথা বলে গেছেন, যা ব্লেকের বালিকণার মতো বিশ্বকে তার স্পন্দনে ধরে রেখেছে। উইলিয়াম ফকনার ‘‘আরবিট্রারি ঘড়ি’’র কথা বলেছিলেন, যেখানে সমস্ত অতীত শুষে নিয়ে বর্তমান ছায়া ফেলে। এলিয়টের মনে হয়েছিল, ‘‘Time past and time future... Point to one end, which is always present.’’

আসলে এরা সবাই যে ‘‘সময়’’-এর কথা বারবার বলতে চাইছে তা কোনও মেকানিক্যাল বা ক্রোনোলজিক্যাল টাইম নয়, বরং চেতনাপ্রবাহের যুক্তিহীন সিকোয়েন্স। ফকনার, উল্ফ বা জয়েস যত চেতনাপ্রবাহর দিকে ছুঁকেছেন, তত তাঁদের লেখা দেখা গেছে আত্মজীবনী হয়ে উঠছে।

জীবনানন্দর উপন্যাসেও সময় চরিত্র হয়ে উঠেছে। কী অবলীলায় লেখেন :

‘টিন থেকে একটা সিগারেট বার ক’রে জ্বেলে নিয়ে বললাম আমরা হাজার-হাজার বছর বাঁচব না, কয়েকটা বছর হাতে আছে শুধু। ম’রে গেলে বেঁচে উঠব না আর! বিজ্ঞানী যা-ই বলুন-না কেন, জেনে গেলাম, সময়ের কোনও শেষ নেই, সৃষ্টি বা শূন্য মার খাবে না কোনও দিন, কোটি-কোটি আলোকবর্ষ শেষ হ’ল, আরও কোটি কোটি এসে পড়বে, আরও কোটি-কোটির কোনও শেষ হবে না আর কোনও দিন। কিন্তু, এ-উপলব্ধির মানে কী যদি-না এই অনিশ্চয় পৃথিবীর ভিতর ঢুকি, একটু স্থির ভাবে ব’সে সকলের দিকে তাকিয়ে না দেখি গভীর ভাবে সকলের কথা না ভাবি; এই দেখা-ভাবার যে-আস্বাদ, যদি স্থির ভাবে ব’সে তা না গ্রহণ করি—

—সকলের কথা বলছেন, ‘‘সকলে’’ কে?

—আলো অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র মানুষের ইতিহাসের গল্প— গত কালের— আজকের— আগামীর— ঝাউবন— বিদ্যুতের বাতি— রাতের প্রজাপতি এই যে ছড়িয়ে পড়ছে— কাগজ উড়ছে— রাতের গভীরতা—গভীর রাতের এই বাতাস— এই ঘর— আপনি—আমি—এরাই তো সব; ‘‘সকল’’।’

(আমরা চারজন, ১৯৩৩)

আমার মনে হয় সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক উপন্যাস ‘‘আমরা চারজন’’।

এবার ‘‘আমরা চারজন’’ উপন্যাসটি সম্পর্কে জরুরি কিছু তথ্য। যদিও আমি জীবনানন্দ দাশের ‘‘চারটি উপন্যাস’’ সম্পাদনার কাজে সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিলাম, নীচের এই লেখাটির জন্য ভূমেন্দ্র গুহ ও প্রতিক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা চারজন উপন্যাসটার প্রেসকপি বানাবার বৃত্তান্তটা এ-রকম ছিল :

‘খ্রি.১৯৩৩ জানুয়ারি মাসে লেখা আর-একখানি উপন্যাস এখন আমাদের হাতে এল লেখক নির্বাচিত শিরোনামে ‘‘উই ফোর’’ অথবা আমরা চার জন। রচনাস্থান কলকাতা, স্বাভাবিক ভাবেই সে-সময়ের হ্যারিসন রোডয়ের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং। লেখকের জীবিকা মূলত বেকারিত্ব, মাঝে-মধ্যে অল্প সময়ের জন্য টিউশনি, এম. সেন’য়ের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের মানে-বই লেখার যূথবদ্ধ ঠিকে-কাজ ছাড়া; ইত্যাদি। এই সময়টায় তিনি অখণ্ড নিষ্কাজের মধ্যে ছিলেন; ছিলেন ব’লে সর্বক্ষণের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন একটা: লেখা, প্রায়শই গদ্য-লেখা। এইরকম একটা সময় আবার তিনি পেয়েছিলেন খ্রি.১৯৪৮’য়ে। মাঝামাঝি সময়টার তৃতীয় বছরটি ছাড়া বাকিটা গদ্য-রচনার দিক দিয়ে পুরোপুরি নিস্ফলা গেছে- চাকরি পাওয়া, পাওয়ার বাস্তবতা ঘটিয়ে তোলা, এবং, অতঃপর, চাকরির ও সংসারনির্বাহের দায়-দায়িত্বে আপাদ-মস্তক জড়িয়ে যাওয়া, তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হতে পারে; আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, আমরা যাকে তাঁর গদ্য-রচনার নিরিখে নিস্ফলা সময় ব’লে চিহ্নিত করছি, সেই সময়ের বৃহদংশ রচনাই উইয়ের কবলে পড়েছিল এমন শোচনীয় পরিণতির সঙ্গে যে, তারা উদ্ধারসম্ভব থাকে নি আর; অথবা, হয়তো, তাঁর দেশত্যাগের সময়ে এই বছরগুলির তাঁর সব লেখা যে- কোনও ভাবে হোক, খোয়া গেছে। যিনি তিরিশের দশকের শুরুর বছরগুলিতে এতটাই ক্রিয়াশীল, তিনি একটা তেমন-ভাবে-কাংক্ষ্য-নয়, এ-রকম মাস্টারির চাকরির সুবাদে কথঞ্চিৎ ব্যবহারিক স্থিরতা অর্জন করতে পেরেই মোটামুটি ভাবে চুপ মেরে যাবেন, ভাবতেও কেমন লাগে যেন। তা হলেও, বাধ্যতামূলক দুর্ভাগ্য-প্রপীড়িত অবসর যে তাঁর জীবনকে ভালোয়- মন্দয় সমান ভাবে ফলপ্রসূ করেছে, তা মানতে হবে।

‘‘আমরা চারজন’’ উপন্যাসটি আলগা বিবেচনায় তিনটি এক্সারসাইজ খাতায় বিন্যস্ত ব’লে ধরে নেওয়া হয়েছিল; খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল দু’টি খাতা; দু’-নম্বর খাতাটির নড়বড়ে মুখপত্রে এ-কথাটা কালিতে লেখা ছিল: ‘‘আ নভেল- খ্রি. তিন-অঙ্কটা যে পরে পেনসিলে পরিবর্তিত হয়েছিল হালকা হরফে, তা নজর এড়িয়েছিল। দু’টি খাতার অবস্থাই, জীবনানন্দ’র রচনার অন্যান্য পাণ্ডুলিপির খাতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার হিসেবেও, অত্যন্তই সঙ্গীন: দু’টো খাতাই মলাট ও সেলাইবিহীন; এক-নম্বর খাতায় ধৃত পাণ্ডুলিপির অংশের প্রথম পাতাটিও চার টুকরোয় আবিষ্কৃত

হয়েছে পাণ্ডুলিপিটা কপি করা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, যার জন্য কপিটির প্রথম পৃষ্ঠার সংখ্যা হতে হয়েছে ''০''—''এক'য়ের পরিবর্তে; খাতাটির মাঝামাঝি দু'টো পাতা হারিয়েই গিয়েছে; দু'-নম্বর খাতাটির তেমন দুরবস্থা হয় নি, মুখপত্রটিও রয়ে গেছে লেখকের নাম, উপন্যাসের নাম, খাতাটির সংখ্যাক্রম, রচনার স্থান এবং কাল—এ-সব খবর বুকে নিয়ে, কিন্তু, একেবারে শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় চাকরির জন্য দরখাস্তের খসড়ার সঙ্গে পাণ্ডুলিপি মেশামেশি হয়ে থেকেছে; দু'টো খাতারই সর্বাংশে খুলে-আসা হলুদ পাতাগুলির স্বাস্থ্য এমনই পলকা যে, আঙুলে ছোঁবার আগেই তারা ভেঙে পড়বে, এমন ভাবে তৈরি হয়ে আছে নিজেরা। খাতা দু'টি যে একই উপন্যাসের অন্তর্গত, তা সাব্যস্ত হল খাতা দু'টিতে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীদের নাম মিলিয়ে দেখে, এবং গল্পের বিবর্তনের ধারার সম্ভবপরতা বিচার ক'রে নিয়ে।

দু-নম্বর খাতাটির সংখ্যাক্রম ''তিন'', আর গল্পটিকে অনুসরণ ক'রে গেলেই বোঝা যায় যে, সংখ্যাক্রম বিচিহ্নিত খাতাটিতে উপন্যাসের গল্পের শুরু। তা হলে, যেটি দুই-সংখ্যক খাতা হওয়ার কথা, সেটি হারিয়ে গিয়েছে। এবং, সেই জন্য, এই খুঁতে উপন্যাসটি এখনই কপি করার কোনও মানে হয় না তো, এ-রকম ভাবা হয়েছিল। এ-রকম ভাবে খাতা দু'টি একটা পুরোনো খামে বন্দি হয়ে আমার টেবিলের দেরাজে বাস করেছে, তা, তিন বছর তো হলই।... 'শেষ পর্যন্ত' কপি করার বিষয়ে প্রথমতার দাবি করল এই উপন্যাসটি এই কারণে যে, সহসা অধিকতর মনোযোগী অন্বেষণে আবিষ্কৃত হল, জীবনানন্দ পেনসিলের গোল্লা-দাগে দু'-নম্বর খাতাটার ''তিন''-ক্রমসংখ্যাটি বাতিল করে পাশেই হালকা পেনসিলের লেখায় ''দুই''-সংখ্যাক্রম লিখে রেখেছেন পরবর্তী কোনও এক সময়ে, এবং এই খাতাটিতে মূল কালিতে-লেখা রচনার পাশাপাশি পেনসিলে কম-পক্ষে পঁচিশটি পৃষ্ঠা নতুন ক'রে লিখেছেন তিনি, ঢ্যারা মেরে পুরোপুরি বাতিল করেছেন মূল লেখার পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা বা, পরিবর্জিত অংশগুলি যোগ ক'রে দেখলে, আরও অনেক পৃষ্ঠা। এবং, দু'টো খাতাতেই পেনসিলে এত সংশোধন-বিসর্জন- সংযোজন করেছেন, দ্বিতীয় খাতাটিতে সর্বাধিক, যে, এখন কপিতে যে-উপন্যাসটি দাঁড়াল, তার প্রায় আধাআধি নতুন লেখা, বলা যায়।

এই সব পরিমার্জনার কাজ তিনি করেছেন খ্রি. ১৯৩৩'য়ের বছর দশ-পনেরো পরে তো অবশ্যই, হাতের-লেখার ধরনে বুঝে নেওয়া যায়, এবং এতটা পুনঃপরিশ্রম তিনি তাঁর আর-কোনও উপন্যাস নিয়ে করেছেন ব'লে জানা নেই; নিশ্চিত ভাবেই এই উপন্যাসটি মাত্রাতিরিক্ত ভাবে তাঁর কাছের জিনিস ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে এ-রকম একটা ধারণায় সুস্থির ভাবে উপনীত হওয়া গেল যে, পরবর্তী কালের শাসনপ্রক্রিয়ায়